প্র ব ন্ধ স ম গ্র

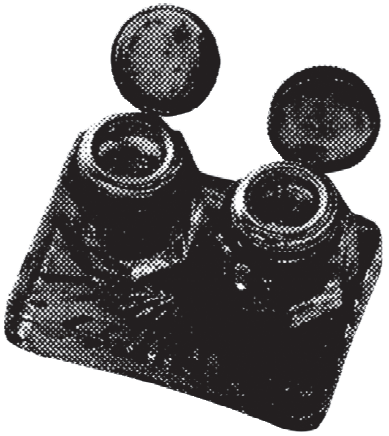

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত দোয়াত দানি

প্রবন্ধসমগ্র

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

প্রবন্ধসমগ্র
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Probondha Samagra by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: November 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-9-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগীদের উদ্দেশে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

সূ চি প ত্র

যুগবাণী

নবযুগ ১৩
'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!' ১৬
ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ ১৯
ধর্মঘট ২২
লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য ২৪
মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? ২৫
বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ২৭
ছুঁৎমার্গ ২৯
উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন ৩৩
মুখবন্ধ ৩৫
রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন ৩৭
বাঙালির ব্যবসাদারি ৪১
আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন? ৪৪
কালা আদমিকে গুলি মারা ৪৫
শ্যাম রাখি না কুল রাখি ৪৭
লাট-প্রেমিক আলি ইমাম ৪৯
ভাব ও কাজ ৫১
সত্য-শিক্ষা ৫৪
জাতীয় শিক্ষা ৫৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭
জাগরণী ৫৯

রাজবন্দীর জবানবন্দী

রাজবন্দীর জবানবন্দী ৬৩

দুর্দিনের যাত্রী

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ৭১
তুবড়ি বাঁশির ডাক ৭২

মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা ৭৩
স্বাগত ৭৫
'মেয় ভুখা হুঁ' ৭৬
পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ? ৭৯
আমি সৈনিক ৮১

রুদ্র-মঙ্গল
রুদ্র-মঙ্গল ৮৭
আমার পথ ৮৮
মোহর্‌রম ৯০
বিষ-বাণী ৯২
ক্ষুদিরামের মা ৯৩
'ধূমকেতু'র পথ ৯৬
মন্দির ও মসজিদ ৯৯
হিন্দু-মুসলমান ১০৪

অন্যান্য প্রবন্ধ
তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা ১০৯
জননীদের প্রতি ১১২
পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব ১১৩
জীবন-বিজ্ঞান ১১৪
আমার ধর্ম ১১৬
মুশকিল ১১৭
লাঞ্ছিত ১২০
নিশান-বরদার ১২২
তোমার পণ কী ১২৩
ভিক্ষা দাও ১২৪
কামাল ১২৬
ভাববার কথা ১২৭
বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য ১২৯
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ১৩৪
বর্ষারম্ভে ১৪১
আজ চাই কি ১৪২
আমার সুন্দর ১৪৫
সত্যবাণী ১৪৯
ব্যর্থতার ব্যথা ১৫১
ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি ১৫২
ধর্ম ও কর্ম ১৫৩

সাহিত্য পরিচিতি

আয়নার ফ্রেম	১৫৪
‘হারামণি’	১৫৫
‘বন্দীর বাঁশী’	১৫৬
‘দিলরুবা’	১৫৭
‘আগামীবারে সমাপ্য’	১৫৮
‘শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া’	১৫৮
‘সাঁঝের মায়া’	১৫৯
‘পথ-হারার পথ’	১৬০
‘সুজনের গান’	১৬২
‘লাঙল’	১৬৩
পোলিটিকাল তুবড়িবাজি	১৬৪
‘গণবাণী’ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ	১৬৭
বাঙালির বাংলা	১৭৩
সুর ও শ্রুতি	১৭৫
মিয়া কা সারং	১৯০
দুটি রাগিণী	১৯০
হোসেনী কানাড়া	১৯১
নীলাম্বরী	১৯২
আমার লীগ কংগ্রেস	১৯২
নবযুগের সাধনা	১৯৫
শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠন-প্রণালি	১৯৬
একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা	২০০

চানাচুর

১. ডোমনি স্টেটাস	২০২
২. পুনর্মূষিকো ভব!	২০২
৩. চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা	২০৩
৪. বিবাহ-আইন বিল	২০৩
৫. চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে!	২০৪
৬. ‘হায় জানতি পার না’	২০৪
৭. ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার!	২০৫
৮. ধনে প্রাণে মারা যায়	২০৫

হক সাহেবের হাসির গল্প ২০৬
লক্ষ্যভ্রষ্ট ২০৯
সতী তুলসী ২১১

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি ২১৩
নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ২২১
নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি ২২৮

যুগবাণী

নবযুগ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইসরাফিলের* শিঙায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে। সাগ্নিক ঋষির ঋকমন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি-পাথারের অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিস্ফারিত। আজ নূতন করিয়া—মহা গগনতলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে-অনন্তমুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন-জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি। সে বাঁশির সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—'পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি!' এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরও অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান—জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কত শত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্মেরও মর্মস্থলে! কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা। গর্দানে তাহার নির্দয়

---

* ইসরাফিল—প্রলয়-শিঙা-মুখে অপেক্ষমাণ স্বর্গীয় দূত।

খামখেয়ালি পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শিলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। সেই যে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাৎ সপাৎ করিয়া জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে, সে যখন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুড়িয়া গর্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কসাইয়ের ভোঁতা ছোরা দিয়া কচলাইয়া কচলাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের ওপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজা-মথিত রক্তের বিপুল ঝাপটা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জলভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নি-রাগে লেখা রহিয়াছে 'নবযুগ'। নয়ন দিয়া তাহার হু হু করিয়া অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এসো!' নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, 'আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।'

আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতাবিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারি' শক্তিকে দলিত করো। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো!' 'আল্লাহু আকবর'* বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের** রক্ত-রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনও বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।' এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল 'আবিরাবির্ম এধি'!*** আবির্ভাব হও! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল। যুগবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ জাতি সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ

---

* আল্লাহু আকবর—ঈশ্বর মহান।

** ফেজ—তুর্কি-সৈনিকের রক্ত-শিরস্ত্রাণ।

*** আবিরাবির্ম এধি—আবির্ভাব হও!

তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত, নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধনবেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে—ঐ দেখো—বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল, হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী—আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়-ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণাধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক।

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসংকোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না! তোমার পুত্র-শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া ওঠে না, মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর-পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকেই হয়তো তোমার বেশি করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়ো না, মা! বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান—ঐ শ্মশানভূমিতে—শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ-পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহিদ* ভাইদের

---

* শহিদ—Martyr ('শহিদ' শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নাই। দেশের জন্য, ধর্মের জন্য যে প্রাণ দেয়, সে-ই শহিদ)।

মুখ মনে করো, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে করো, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বোনে-বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!'

স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ-মুখো হইয়া কোন অজানা পাষাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতোই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!' বাস্তবিক আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব, এরূপ কোনো কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না। আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা ভুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার জাঁতায় পিষ্ট করিতেছে, তাহারাও চিরকাল স্বাধীন ছিল না। শক্তি লাভ করিয়া যাহারা শক্তির এমন অপব্যবহার করিতেছে, কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্মম হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে! 'এয়সা দিন নেহি রহেগা', চিরদিন কারুর সমান যায় না। আজ যে কপর্দকহীন ফকির, কাল তাহার পক্ষে বাদশাহ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। আজ আমি যাহার ওপর প্রভুত্ব করিয়া তাহার প্রকৃতি-দত্ত স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও সম্মানকে হনন করিতেছি, কাল যে সেই আমারই মাথায় পদাঘাত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? শক্তি সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।

অন্যকে কষ্ট দিয়া তাহার 'আহা-দিল'** নিতে নাই, বেদনাতুরের আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লার আরশ*** টলিয়া যায়। শক্তির অপব্যবহারের জন্য রোম-সাম্রাজ্য গেল, জার্মানির মতো মহাশক্তিরও পরাজয় হইল। কত উত্থান, কত পতন এই ভারত দেখিয়াছে, দেখিতেছে এবং দেখিবে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিবেক সর্বদাই মানবের পশুশক্তিকে সতর্ক করিতেছে। বিবেকের ক্ষমতা অসীম। যাহারা পশুশক্তির ব্যবহার করিয়া বাহিরে এত দুর্বার দুর্জয়, অন্তরে তাহারা বিবেকের

** আহা-দিল—যন্ত্রণা পেয়ে ব্যথিত নিঃশ্বাস আর নীরব-অভিযোগ।

*** আরশ—ভগবানের সিংহাসন।

দংশনে তেমনি ক্ষত-বিক্ষত, অতি দীন। তাহারা তাহাদের অন্তরের নীচতায় নিজেই মরিয়া যাইতেছে, শুধু লোক-লজ্জায় তাহাকে দাম্ভিকতার মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছে। সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে লুকানো গর্দভ-মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। নীল শৃগালের ধূর্তামি বেশি দিন টিকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দিই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মতো সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, 'মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি'। হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান—মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি-ভরা মহা-গৌরবময় মৃত্যু।—তখনও মুক্তির সেই যুগান্তরের নবযুগেও আমরা কিনা পলে পলে দাসত্বের, মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মতো অধোদিকেই গড়াইয়া চলিতেছি! এতদূর নীচ হইয়া গিয়াছি আমরা যে, কেহ এই কথা বলিলে উলটো আবার কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিই। আমাদের এই তর্কের সবচেয়ে সাধারণ সূত্র হইতেছে, দাসত্ব—গোলামি ছাড়িয়া দিলে খাইব কী করিয়া? কী নীচ প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর-বিড়ালের মতো উদর-পূর্তির জন্যই জন্ম! এমন নীচ অন্তঃকরণ লইয়া যাহারা বেহায়ার মতো বেহুদা* তর্ক করিতে আসে, তাহাদের ওপর খোদার বজ্র কেন যে ভাঙিয়া পড়ে না, তাহা বলিতে পারি না! আজ সারা বিশ্ব যখন ওরকম মরার মতো বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, তখনও আমাদের এই রকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়ই দুঃখে তাই বলিতে হয়, 'এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার!' আমাদের এ মোহ-ভার ভাঙিবে কে? এ-শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা, 'আমরাই!' নির্বোধ মেষ-যূথের মতো এক স্থানে জড়ো হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলে নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না, তাহা হইলে আমাদের ঐ নেকড়ে বাঘের মতো করিয়া কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে।

দেশের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিতেছে, কিন্তু কাজে আমরা কেহই সাড়া দিতে পারিতেছি না। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কী করিতেছে আগে দেখাও, তারপর আমাদিগকে বলিয়ো। এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন। দেশমাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহার বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সেই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কী করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু পিছু পোঁ ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, তোমার কর্তব্য-জ্ঞানই তো তোমার নেতা! দেশনায়ক

---

* বেহুদা—বাজে।

যাঁহারা, তাঁহারা তো তোমার বিবেকেরই প্রতিধ্বনি করেন। কর্তব্য-জ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং 'ইহা সম্ভব, উহা অসম্ভব' বলিয়া, ছেলেমানুষি করাও আর এক বোকামি। যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্য তোমার ডাক পড়িত কী জন্য? অসম্ভব বলিয়াই তো দেশ তোমার বলিদান চাহিয়াছে। স্বার্থের গণ্ডি না পারাইয়া ভিক্ষা দেওয়া যায়, ত্যাগ বা বলিদান দেওয়া যায় না। তোমার যতটুকু শক্তি আছে প্রয়োগ করো, দেশের কাছে, খোদার কাছে অসংকোচে দাঁড়াইবার পাথেয় সঞ্চয় করো, তোমার বিবেকের কাছে তুমি অগাধ শান্তি পাইবে! ইহাই তোমার পুরস্কার। অন্যে জাহান্নামে যাইবে বলিয়া কি তুমিও তার পিছু-পিছু সেখানে যাইবে?

আজ আমাদের শুধু ক্লান্তি—শুধু শ্রান্তি কেন? 'এমন করে কদ্দিন খাবি', না 'গোলেমালে যদ্দিন যায়' করে আর কতদিন চলিবে? আমরা আমাদের দেশের জন্য, মুক্তির জন্য কি দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না? ত্যাগ, বিসর্জন, উৎসর্গ, বলিদান ছাড়া কি কখনো কোনো দেশ উদ্ধার হইয়াছে, না হইতে পারে? স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, ত্যাগ কখনো আরাম-কেদারায় শুইয়া হয় না। কিন্তু এই দুঃখকষ্ট, ইহা তো বাহিরের; একটা সত্য মহান পবিত্র কার্য করিতে গেলে যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, অন্তরে যে ভাস্বর স্নিগ্ধ দীপ্তির উদয় হইয়া সকল দেহমন আলোয় আলোকময় করিয়া দেয়, সারা দেশের ভাইদের বোনদের যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি ও সারা মুক্ত বিশ্বের শাবাশি পাওয়া যায়, তাহা এই বাহিরের দুঃখকষ্টকে কি ঢাকিয়া দিতে পারে না? কার মূল্য বেশি? বাহিরের এই নগণ্য দুঃখ-কষ্টের, না অন্তরের স্বর্গীয় তৃপ্তির? তুমি কী চাও?—কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণ্য-মরা মরিতে, না মানুষের মতো মরিয়া অমর হইতে? তুমি কি চাও?—শৃঙ্খল, না স্বাধীনতা? তুমি কী চাও?—তোমাকে লোকে মানুষের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক? তুমি কী চাও?—উষ্ণীষ-মস্তকে উন্নত-শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো গৌরব-দৃষ্টিতে অসংকোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জপৃষ্ঠে গোলামের মতো অবনত হইয়া হুজুরির মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নামে যাও! তোমার সারমেয় গোষ্ঠী লইয়া খাও-দাও আর পা চাটো! আর, যাহারা ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, যাহারা ঘরে মুখ মলিন দেখিয়া গলিয়া যাইবে না, যাহাদের জান দিবার মতো গোর্দা* আছে, আঘাত সহিবার মতো বুকের পাটা আছে, তাহারা বাহির হইয়া আইস! দেশমাতার দক্ষিণ হস্ত, আর কল্যাণ-মন্ত্রপূত অশ্রু-পুষ্প তোমাদেরই মাথায় ঝরিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা চাই লাঞ্ছনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ অনুলিপ্ত

---

* গোর্দা—হৃৎপিণ্ড, অর্থাৎ অসম সাহস।

করিতে। কল্যাণের মৃত্যুঞ্জয় কবচ আমাদের বাহুতে-উষ্ণীষে বাঁধা, ভয় কী? মনে পড়ে, সে-দিন দেশমাতার আহ্বান নিয়া মাতা সরলা দেবী বাংলার কন্যারূপে পাঞ্জাব হইতে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলেন। কে কে সাড়া দিলে এ জাগ্রত মহা-আহ্বানে? এমন ডাকেও যদি সাড়া না দাও, তবে জানিব তোমরা মরিয়াছ। বৃথাই এ আহ্বান এ ক্রন্দন তোমার, মা! যদি পারো, সঞ্জীবনী সুধা লইয়া আইস তোমার এ মরা সন্তান বাঁচাইতে। যদি তাহা না পারো, তবে ইহাদিগকে ধুতুরার বীজ খাওয়াইয়া পাগলা করিয়া দাও। ইহাতে তাহারা 'মানুষের মতো' জাগিবে না, কিন্তু তবু জাগিবে! জানি, কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখনো নয়, কিন্তু আর এমন করিয়া স্নেহের প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, মা, এখন তোমাকে কুমাতা হইতে হইবে, তোমাকেই আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইতে হইবে। আমরা পরের আঘাত চোখ বুজিয়া সহ্য করি, কিন্তু স্বজনের আঘাত সইতে পারি না। তাই আর শুধু ডাকাডাকিতে কোনো ফল হইবে না। তোমার রুদ্রমূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক। যদিই এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে, রণ-চণ্ডীর মহামারির মধ্যে, আমাদের মনুষ্যত্ব জাগে, যদি আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানিত হইয়া আবার আমরা জাগি। তাই আবার বলিতেছি, তোমরাও সাথে সাথে বলো,

'গেছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ!'

ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ

আমাদের হিন্দুস্থান যেমন কীর্তির শ্মশান, বীরত্বের গোরস্থান, তেমনি আবার তাহার বুক অত্যাচারীর আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। সেই সব আঘাতের কীর্তিস্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষ দুনিয়ার মুক্তবুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যত কিছু কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের সব কিছুরই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের চোখে শূলের মতো বাজিতেছে। কিন্তু এই সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মতো আমাদের সামনে জাগিয়া থাক, ইহা খুব ভালো কথা—কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে-কোনো প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কসাইয়ের আবির্ভাব মস্ত বড়

মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদেরই সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে?—ডায়ার।

মানুষের, জাতির, দেশের যখন চরম অবনতি হয়, তখনই এইরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষ যখন নিজের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের কথা ভুলিয়া যায়, শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার আর মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, প্রভুর দেওয়া দয়ার দানকে গোলামের মতো সে মহাদান বলিয়া মাথায় তুলিয়া বরণ করিয়া লয় এবং তাহার ভৃত্য-জীবন সার্থক হইল মনে করে। তাহার মন এত ছোট হইয়া যায়, তাহার আশা এত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে যে, সে ভাবিতেও পারে না—যে দান মাথায় করিয়া আজ সে গৌরব অনুভব করিতেছে, যে দানকে সে শিরোপা* করিয়া (অভিরুচি অনুসারে কখনো পেছনে লেজুড়ের মতো জুড়িয়া) মুক্ত-স্বাধীন বিশ্বের কাছে বক্ষস্ফীত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দাম এক কথায় 'পাঁচ জুতি'!

মনুষ্যত্বের এ অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুধু ভিক্ষুকের জাতিই হাসিমুখে নিজেদের গৌরব বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য নীচ ছোট হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের এত অসাড়-হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই—এই ডায়ারের দেওয়া অপমানের মতো বজ্র বেদন।

এই ডায়ারের মতো দুর্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মতো করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মতো আমাদের এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত—না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনোই না। আজ আমাদের সত্যিকার শোচনীয় অবস্থা সাদা চোখে দেখিতে পারিয়াছি এই ডায়ারেরই জন্য। ডায়ারের প্রচণ্ড পদাঘাত, পৈশাচিক খুন-খারাবি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া আমাদের ঘৃণ্য হীন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। আরও জানাইয়া দিয়াছে যে—যে নিষ্ঠীবন মাথায় করিয়া প্রভুর দেওয়া যে চাপরাশ পরিয়া, যে ছিন্ন জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহমকের মতো দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া—গোলামির ঝুটা গৌরব দেখাইতে গিয়া শুধু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, তাহাতে কেহ আমাদের প্রশংসা তো করেই নাই, উলটো আরও, 'হট যাও গোলাম কা জাত' বলিয়া অবলীলাক্রমে লাঠির গুঁতো, বুটের টক্কর লাগাইয়াছে। তাহারা স্বাধীন—আজাদ; তাহারা আমাদের এ হীন নীচতা, এত হেয় ভীরুতা, এমন ঘৃণ্য কাপুরুষতাকে পা দিয়া মাড়াইয়া যাইবে না তো কি মাথায় তুলিয়া লইবে? অন্ধ

---

* শিরোপা—শিরোভূষণ, পুরস্কার।